অগ্রন্থিত গল্প

হারা ছেলের চিঠি

মা,

সেদিন ছিল যাত্রানাস্তির দিন যেদিন ভোরে নতুন করে পুবের পানে পা বাড়ালাম! ঐ পুবের পারে উদয়-রবির তোরণদ্বারে সেদিন সোহিনী-বিভাস পূরবীর মতো কান্না কেঁদে আমায় ডাক দিয়েছিল। আমার মনের বীণায় বুঝি সে সুর-মূর্চ্ছনার ছোঁওয়া লেগেছিল। সাগরপারের আমার সেই অচেনা বীণ-বাদিনীর কাজল চোখে তখন বাদল নেমেছিল। সে বিদেশিনীর সজল চাওয়ার মিনতি ইঙ্গিত আমি সেদিন বুঝিনি। তার দীঘল ঘন আঁখিপল্লবের কম্পনে কম্পনে যে কালো ছায়াছবির মায়া দুলছিল, তাকেই আমি সেদিন বোবা বালিকার পথে বেরিয়ে পড়ার হাতছানি মনে করেছিলাম। তাই পথহীন পথের বুকে দাঁড়িয়ে আমি ঐ সীমাহারা পুবের পানে হাত বাড়ালাম। তখন ছিল যাত্রানাস্তির ক্ষণ। মনে হলো, ঐ নীল আকাশের নিতল চোখে জল-ছলছল শুকতারাটি যেন তারি আঁখিতারা, তার করুণ কিরণের অরুণ সুর আমার হিয়ায় হিয়ায় পথিক বধূর বেদন জাগিয়ে গেল। তোমার পলাতকা পথিক-শিশু আবার পথে বেরিয়ে পড়ল।

পথ চলতে চলতে মনে হলো, এই আমার সেই 'বিপুল সুদূর'—সেই অদেখা বন্ধু, যার বাঁশির সুর আমায় দিশেহারা বাউল, পথহারা পথিক করে পথের পর পথ ঘুরিয়ে মারছে—কোথাও বাসা বাঁধতে দিচ্ছে না। ঝড়ের রাতে নীড়হারা বিহগ শাবকের মতো আমি একটু আশ্রয় আশায় শুধু দিগ্বলয়ের কোল ঘেঁসে ঘেঁসে উড়ে বেড়িয়েছি, ঘরের পানে তৃষিত-ব্যাকুল চোখে চেয়েছি, আর কেমন এক বিদ্রোহ-অভিমানে আমার দুচোখ ফেটে জল গড়িয়ে পড়েছে। কিন্তু সে আশ্রয়ও আমি পাইনি, ঘরও মেলেনি—তোমার মতন করে এ বুকে কাঁটা-বেঁধা পাখিকে কেউ বুকে তুলেও নেয়নি—আজ আমি আবার ছুটে যেতে চাই কেন? কিসের এত অভিমান-ক্রন্দন আজ আমার বুকে নিখিল মাতৃহারা শিশুর আকুল হাহাকার হানছে? আত্মীয়-পরে সবাই মিলে যার গলায় কসাইয়ের মতো ছুরি চালিয়েও কাঁদাতে পারেনি, ভগবান যার প্রথম এবং প্রধান শত্রু, রুদ্রদেব সারা বিশ্বের অশান্তি আর অভিশাপ হেনেও যাকে পরাজয় মানাতে পারেনি, তাকে তুমি কেমন করে এমন অসহায় শিশুর মতন করে ডাক ছেড়ে কাঁদালে? কেন তাকে কাঁদালে? আর কিসের এ দুর্জয় ক্রন্দন আমার? কেন আজ মনে হচ্ছে, এই আমার একবার প্রাণ খুলে পথে পথে কেঁদে বেড়াবার দিন? আজ আমার মনে পড়ছে, যে কেউ আমায় আদর করে বুকে ধরতে এসেছে, অমনি সে জ্বলে 'পুড়ে' খাক হয়ে গেছে।

আর অবাক বিস্ময়ে স্তব্ধ অকারণ আহত আমি, শুধু জল-ভরা চোখে কোনো নিষ্ঠুর নিয়ন্তার পানে তাকিয়ে কী যেন জিজ্ঞাসা করতে চেয়েছি! অমনি দূরে দূরে শাল-পিয়ালের শ্যামল পথ পারায়ে ঐ বীণ-বাদিনীর কচি কণ্ঠের সিক্ত-সুর এই বলে আমায় কাঁদায়ে গেছে :

সে মানুষ আগুন-ভরা, পড়লে ধরা
সে কি বাঁচে?
কেবলই এড়িয়ে চলার ছন্দে যে তার
রক্ত নাচে!

কিন্তু সত্যই কি আমি আগুন-ভরা? সত্যিই কি আমার আগুন আঁচে গৃহবাসীর ঘরের শান্তি পুড়ে ছারখার হয়ে যায়? কেন? আমি বোধ হয় ভুলেও কোনোদিন কোনো শত্রুরও শত্রুতা-সাধন করিনি। আমি পথের পথিক, পথের ভিখারি, চির-গৃহ-হারা। আমার শত্রুই বা কে, আর কারই বা অনিষ্ট করব? আমি তো দুঃখ দিতে চাইনে, আমি চাই শুধু আনন্দ দিতে, নিজে সারা বিশ্বের, নর-নারীর সকল অকল্যাণ-বিষ আকণ্ঠ পান করে নীলকণ্ঠ হয়ে ঘরে ঘরে কল্যাণ বিলাতে! তবে, এ কোন নির্মম শক্তি আমার মঙ্গল-পথে কাঁটার ঝোড়া দেয়? তবু কি বলতে হবে মা, যে, 'মঙ্গলময়' বিশেষণে বিশেষিত বিধাতা নামক কোনো জীব এ বিশ্বকে সুনিয়ন্ত্রিত করে চালাচ্ছে? নাই—নাই, এই বিশ্বের সৃষ্টিকর্তা নিয়ন্তা কেউ নাই।

যাক সে কথা। কি বলছিলাম? সেদিন ছিল ১৩২৭ সালের ২১শে চৈত্র, রবিবার, নিশিভোর ; দিন ক্ষণ সমস্ত কিছু ছিল যাত্রানাস্তির, যেদিন অকারণে বিনা-কাজের আহ্বানে পুবের পানে পাড়ি দিলাম। সে যাত্রার কথা আমার প্রাণ-প্রিয়তম বন্ধুদেরও জানালাম না, পাছে তারা বাধা দেয়। আমায় যে তখন চলায় পেয়েছে, তখন পথ যে আমায় ডাক দিয়েছে। আমি এই একটা আশ্চর্য জিনিস দেখে আসছি যে, কাজের মাঝে ডাক পড়লে আমি তাতে সাড়া দিতে পারি না, কিন্তু বিনা কাজের ডাকে আমার মাঝের পাগল কি উল্লাসেই না নৃত্য করে ওঠে!

কেন চলেছিলাম? কিসের আশায় চলেছিলাম? কে আমায় দুঃখ দিল যে, আমার পথের বাসা হাতের সুখে বানিয়ে এমন করে পায়ের সুখে ভেঙে পথে দাঁড়ালাম? তা জানিনে! ... আজ এক-বুক বেদনা বুকে চেপে ঐ অকারণ-যাত্রার মানেটা হাজার রকমে বুঝতে চেষ্টা করছি আর সেই ব্যর্থ চেষ্টার ব্যথা ক্লেশে মাথার আর বুকের ভেতরটা আমার যেন কেমন নিঃসাড় হয়ে আসছে—কে যেন আগুনের হাতুড়ি নিয়ে পাঁজর-চাপা এই খাঁজরা কলজেটাতে ঘা মারছে।

আমার বড্ডো আদরের পথে পাওয়া এক ছোট বোন মরণ-শিয়রে দাঁড়িয়ে, তার এই পালিয়ে-বেড়ানো পথিক-ভাইটিকে ধরতে পাঠিয়ে সেই পথের বুকে তার আশা-আকাঙ্ক্ষা বিজড়িত শেষ দৃষ্টিটুকুর করুণ সোহাগ-কান্না বিছিয়ে রেখেছিল। পথের নেশা

আমায় এমন মাতাল করে তুলেছিল যে, নির্মম আমি, আমার অভিমানী বোনের সে অধিকার দুপায়ে দলে চলে গেছি। সে শুধু জল-ভরা চোখে এই স্নেহ অধিকারের পরাজয় চেয়ে চেয়ে দেখেছে—কিছু বলেনি! তার ঐ কিচ্ছু-না-কওয়াটাই আমার বুকে দাগ কেটে কেটে বসে যাচ্ছে! আমার এ অপরাধ সে ক্ষমা করবে কিনা জানি না, কিন্তু সে করলেও আমি কোনোদিন নিজেকে ক্ষমা করতে পারব না। স্নেহ-অধিকারকে মাড়িয়ে যাওয়ার বুঝি ক্ষমা নাই।

হায়! কত দুঃখের, কত ক্লেশের, কত আশা-ভরসার বন্ধনে আমি নিজেকে জড়াই আমার এই পথে-পাওয়াদের মাঝে! আর কত নিবিড় করেই না তাদের এই হারা-ভিতু বুকের তলায় জড়িয়ে ধরি! আবার, সে কোন মুহূর্তে এক নিমেষের ভুলে, এক অজানা ক্ষণের খামখেয়ালিতে কি নিষ্করুণভাবেই না সে বেদনা-বন্ধন ছিঁড়ে ফেলে আর এক অজানা পথে ছুটে চলি! সে ভুল এত বড় ভুল যে সারা জীবনের সাধনাতেও তা আর বুঝি শোধরানো যায় না। এ কি অশেষ্যান্তির অভিশপ্ত অশান্ত জীবন আমার! কে আমায় এই নির্দয় ভুল করায়? কে এমন করে আমার পথের বাসা ধারেবারে ঝড়ে উড়িয়ে দেয়? কে সে? কেন তার এ অহেতুক দুষমনি আমার ওপর?

এই বন্ধন ছিন্ন করে করে আজ দেখছি, এতে ক্ষতি হয়েছে আমারি সবচেয়ে বেশি, দুঃখ পেয়েছি আমিই সবেচেয়ে বেশি! এতে যে আমার নিজের বুকই ছিন্নভিন্ন হয়ে গেছে। আমি যে বাঁধন খুলিনি, বাঁধন ছিঁড়েছি। আর, ঐ টেনে ছেঁড়ার দরুন প্রতিবারই একটা করে শক্ত গিঁট আমার কলজে-তলায় কেটে বসে গেছে! তাই আজ আমার এই হৃদয়রোগের সৃষ্টি, আজ নিশ্বাস-প্রশ্বাস নিতেও আমার এত কষ্ট! দম যেন আটকে আসছে, তবু একেবারে বন্ধ হয়ে যাচ্ছে না! হিয়ায় হিয়ায় আমার এক বীভৎস খুনখারাবি—শুধু লাল আর লাল! খানখান খুন!! সে ছিন্ন গ্রন্থি-বন্ধনগুলোর সব কটাই আমার হৃদপিণ্ডটা জুড়ে ক্রমেই দাগ কেটে কেটে বসে যাচ্ছে, আর ততই আমার নিশ্বাস-প্রশ্বাসের ক্রিয়া দীর্ঘ হতে দীর্ঘতর হয়ে ঝাউ-এর বুকে উত্তুরী হাওয়ার লুটিয়ে-পড়া কাঁদনের মতো কাৎরে কাৎরে উঠছে! উঃ, সে কি ভীষণ যন্ত্রণা মা!

হ্যাঁ, তবু আমায় যেতে হলো। সকলের স্নেহ-অধিকারের কাতর কান্না আহ্বানকে পরাজিত করে আমায় উড়িয়ে নিয়ে গেল, পুবের হাওয়ায় ভেসে-আসা ঐ বেদন সুর। সে তখন গাচ্ছিল—'ওরে সাবধানী পথিক! বারেক পথ ভুলে মর ফিরে।' আমার মনের কোণে কেমন যেন কাতর কান্না গুমরে গুমরে ফিরতে লাগল। 'ওরে এই বেলা বেরিয়ে পড়, নইলে আর সে অসম্ভাবিতের দেখা পারিনে—পাবিনে!' হায়, কে সে অসম্ভাবিত আমার? কোন আপনজনকে এবার পাব আমি? কোন হারা মা আমায় ডাক দিয়েছে? আচ্ছা, যে স্নেহ আমায় ডাক দিয়েছে, যে ঘরের মায়া এমন করে আমায় পথের পানে আকর্ষণ করছে, সে কি নিজে হতে এসে ধরা দেবে না? সেও কি আমার আশায় পথ চলছে না? আবার মনের বনে আমার প্রতিধ্বনি উঠল, 'না রে

পাগল! তার চলা যে অনেক-অনেক যুগের! এবার তোকেই এগিয়ে গিয়ে তাকে পেতে হবে।' পুবের হাওয়ায় ঐ কথাটি আমি গানের সুরে পথে পথে গেয়ে বেড়াতে লাগলাম :

কবে তুমি আসবে বলে রইব না বসে
আমি চলব বাহিরে।
ঐ শুকনো ফুলের পাতাগুলি পড়তেছে খসে—
আর সময় নাহি রে ...

তারপর যেতে যেতে দেখলাম পথের দুধারি ঘাসে আর কাশের সারি ছোট্টো অভিমানী মেয়ের মতো শীষ দুলিয়ে দুলিয়ে বলছে—'না, না, না!' ধানের কচি চারাগুলি তাদের অধরপুটে সবুজ হাসি ফুটিয়ে মাথা হেলিয়ে আঙুল তুলে শাসাচ্ছে—'না, না, না!' দূরে দিগন্ত-ছোঁওয়া গ্রামে সীমায় লাজনত বাঁশের বধূ মাটির পানে চেয়ে চেয়ে শ্বাস ফেলছে আর কেঁপে কেঁপে জানাচ্ছে, 'না, না, না!' বাঁধাঘাটে কাঁখের কলসি জলে ভাসিয়ে দিয়ে কিশোরী পল্লিবধূ আমার রথের পানে চেয়ে সজল চোখের করুণ চাওয়ার ভাষায় প্রশ্ন করছিল, 'কোথা যাও, ওগো বিদেশি পথিক?' সে বালিকাবধূ ভাবছিল, হয়তো তার রূপের বাড়ির কাছেই আমার বাড়ি। হয়তো তাদের ঘরের সামনে দিয়ে আমার চলার পথ। আহা, ওর যে তাহলে কত কথাই জানাবার আছে তার বাপ-মাকে, তার ছোট ছোট ভাইবোনগুলিকে! ঐ ছোট্টো মেয়েটির দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে এ গৃহহারার চোখ দুটি জলে ভরে উঠল! আহা, মার কোল-ছেঁড়া গৃহহারা দিদি আমার! আমি তোদের দেশের নই বোন, তবু কেন তোকে দেখে এত কান্না পায়! তোর চোখে আজ সারা বাংলার ঘরহারা বালিকাবধূর ব্যথা ঘনিয়ে উঠেছে যে ভাই! ঘরের মায়া এমনই বেদনা-বিজড়িত মধুর! দেখলাম, ময়নামতি শাড়ির খুঁটে চোখ মুছে ভরা কলসি কাঁখে সে ধানখেত পারিয়ে সুপারি গাছের সারির মাঝে মিলিয়ে গেল। 'রাজা রানি' নাটকের 'কুমার'-এর 'ইলা'-র সঙ্গে কথোপকথনের সেইখানটা মনে পড়ে গেল, যেখানে 'কুমার' তার বড় সোহাগের বড় আদরের ছোট বোন 'সুমিত্রা'-র কথা মনে করে চোখের জল ফেলছে। 'সুমিত্রা' তখন পর হয়ে গেছে—তার বিয়ে হয়ে গেছে। সেই কথাটি সে 'ইলা'-র কাছে প্রাণ-কাঁদানো ভাষায় করুণ মধুর করে বলছে। সেই সঙ্গে 'ইলা'র মর্মস্পর্শী গানটিও মনে পড়ে গেল :

এরা পরকে আপন করে, আপনারে পর।
বাহিরে বাঁশির সুরে ছেড়ে যায় ঘর!

আরো দেখলাম, কলার ভেলায় চড়ে উদাসীন পথিক গাঙ পার হচ্ছে, আর গাঙের দুপাশের ধানের চারায় ধানী হরফে লেখা তার যেন কোনো হারানো-জনের পত্র-লেখা আনমনে পড়তে পড়তে যাচ্ছে। আমার মনের গাঁয়ের চিরদিনের পসারিনী তখনো

'কে নিবি গো কিনে আমায়, কে নিবি গো কিনে' হেঁকে হেঁকে দখিন হাওয়াকে ব্যঙ্গ দিচ্ছিল।

রোদে-পোড়া দুপুরটা তৃষ্ণাকাতর যমকাকের মতো হাঁপাচ্ছে আর খাঁ খাঁ করছে, তখন তরী আমাদের পদ্মার বুকে ভাসল! দেখলাম পদ্মার শুকনো ধূ-ধূ করা চরটা নির্জলা একাদশীর উপবাসক্লান্ত বিধবা মেয়ের মতো উপুড় হয়ে পড়ে পড়ে ধুঁকছে। ও-পারে মানিকগঞ্জের সীমানা সবুজ রেখায় আঁকা। এ-পারে ফরিদপুরের ঘন বনছায়া। এ-পারে ও-পারে দুটি সাথীহারা কপোত-কপোতী কূজন-কান্নায় তখন যেন সারা দুপুরটার বুকে দুপুরে মাতন জুড়ে দিয়েছিল! কী এক অকূল শূন্যতার ব্যথায় বুকটা আমার যেন হো হো করে আর্তনাদ করে উঠল।

মা! যেদিন নিজে নিজে কেঁদে তোমাদের কাঁদিয়ে বিদায় নিয়ে আসি, সেদিন আসন্ন বিকালে এই গোয়ালন্দের ঘাটে পদ্মার বুকে স্টিমারে রেলিং ধরে ঐ ওপারে—মানিকগঞ্জের সবুজ সীমারেখার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে, আমার বুক চোখের জলে ভেসে গিয়েছিল। তুমি যে বলেছিলে যে, ঐখানে—ঐ অপরপারের সুনীল রেখায় আমাদেরও ঘর ছিল। সে ঘর হয়তো আজো আছে, কিন্তু সে আজ পোড়োবাড়ি, আরো মনে পড়ল, ঐ গাঁয়েরই চিতার বুকে হয়তো এই কীর্তিনাশারই অপর কূলে, আমার হারা-বোন বেলীর স্মৃতি ছাই হয়ে পড়ে আছে। ওরে কোথা সে সর্বগ্রাসী শ্মশান-মশান? কোথায় সে শতস্মৃতি বিজড়িত পোড়ো ঘরখানি? আমায় সবচেয়ে বেশি করে কাঁদাতে লাগল আমার ঐ দুটি হারা-বোন লিলি আর বেলীর পোড়া স্মৃতি! সবচেয়ে বেশি দুঃখ রয়ে গেল আমার, আমি তাদের দেখতে পাইনে! বেলা নাকি যাবার দিনে 'পদ্ম-পলাশ-আঁখি' দেখেছিল! এই কথা শুনে কমলা প্রমীলা হেসে উঠেছিল, তাই সে রেগে বলেছিল, 'তোরা কখনো তাঁকে দেখতে পাবিনে, তোরা মিথ্যা বলিস, যারা মিছে কথা কয়, তাদের তিনি দেখা দেন না!' ঐ সত্য আর তেজের মধ্য দিয়েই তার রহস্যুগের সহজ সাধনা পূর্ণতা লাভ করে আসছিল, তাই যেদিন সে পদ্ম-ইলিশ-আঁখির চাওয়া দেখল, সেদিন সে মুক্ত। সে মুক্তকে কি আর আমরা বেঁধে রাখতে পারি? তাই সে বাঁধন-হারা মেয়ে বাঁধন কেটে চলে গেল।

ওরই ঘণ্টাখানিক আগে আমার আর একবার বুক তোলপাড় করে উঠেছিল, যখন এপারে ফরিদপুরের পানে তাকিয়ে মনে হয়েছিল, ঐ ছায়া-সুনিবিড় কোনো একটি গৃহের আঙিনার তুলসী-মঞ্চে আমার স্নেহময়ী তেজস্বিনী মাসী-মার সন্ধ্যা-প্রণামগুলি হারিয়ে গেছে! স্বাহা কন্যা আমার এই দীপ্তিমতী সন্ন্যাসিনী মাসিমাকে মনে পড়ে আমার আকুল কান্না চেপে রাখতে পারিনি। আচ্ছা বলতে পারো, এ তপস্বিনী মেয়ের হাতের নোওয়া, সিঁথির সিঁদুর কেড়ে বিধাতার কি মঙ্গল সাধিত হলো? কে এর জবাব দেবে মা? এতেও কি বলতে হবে যে, মঙ্গলময় নামের কোনো একটি বিশেষ দেবতা আছেন—যাঁর সকল কাজেই কল্যাণ রয়েছে? এই বিধবা মেয়েদের দেখলে আমার বুকের ভেতর কেমন যেন তোলপাড় করে ওঠে। বাংলার বিধবার মতো বুঝি এত করুণ—এত হৃদয়বিদারক দৃশ্য আর নেই। এই তপস্বিনীদের উদ্দেশে আমি আমার হৃদয়-জোড়া

শ্রদ্ধা নিবেদন করলাম—আরো মনে পড়েছিল, আমার বিদ্রোহিনী মেয়ে ছোটোমাসি মার কথা।

আমি ছায়া-সুনিবিড় ঐ এপার ওপারে গাছের সারির পানে সজল চোখে চেয়ে চেয়ে চিনবার চেষ্টা করতে লাগলাম; কোথায় আমার সেই মা-মাসিমার পরশপূত হারা-গৃহগুলি?

পদ্মার বুকেই ধোঁয়ার মতন ঝাপসা হয়ে মলিনা সন্ধ্যা নেমে এল! সন্ধ্যা এল, ধূলি-ধূসরিত সদ্য-বিধবার মতন ধূমল কেশ এলিয়ে, দিগ্‌বালাদের মেঘলা অঞ্চলে সিঁথির সিঁদুরটুকুর শেষ রক্তরাগ মুছে! ধানের চারায় আর আমার চোখে অশ্রু-শীকর ঘনিয়ে এল!

চাঁদপুরে যখন রেলে চড়লাম, তখন সন্ধ্যা বেশ ঘনিয়ে এসেছে। ট্রেন চলতে লাগল। আমি কেমন যেন উন্মনা হয়ে পড়লাম। অলস উদাস চোখে আমার শুধু এইটুকু ধরা পড়ছিল যে, ভীষণ বেগে উল্টোদিকে ছুটে যাচ্ছে—আঁধার রাতের আঁধারতর গাছপালাগুলো। চলন্ত ট্রেনের ছায়াটা দেখে মনে হচ্ছিল, যেন একটা বিরাট বিপুল কেন্নো ছুটে যাচ্ছে।

কুমিল্লায় যখন নামলাম, তখন বেশ রাত হয়েছে। কন্দর্পের মতো সুন্দর এক যুবক আমায় 'এসো' বলে হাত বাড়াল—তার পদ্ম-পলাশ-আঁখি দেখে, আঁখি আমার জুড়িয়ে গেল! আমরা না চিনতেই পরস্পরকে ভালোবাসলাম। সে উল্টো আমাকেই পদ্ম-পলাশ আঁখি বলে ডাকল। আমার চোখে জল ঘনিয়ে এল।

দুটি ভাইয়ে গলাগলি করে যখন আঙিনায় এসে দাঁড়ালাম, তখনও সেখানে নিশি যেন নিশি-জেগে বসে আছে। প্রথমেই দু-তিনটি চঞ্চল দুষ্টু মেয়ে চোখে পড়ল। তারা সকৌতুক-বিস্ময়ে আমার পানে তাদের ডাগর চোখ মেলে তাকিয়ে রইল।

তুমি এসে দাঁড়াতেই আমি কেমন অভিভূতের মতো তোমার পানে চেয়ে রইলাম। আমার এখন মুখর মুখও মূকের মতো কথা হারিয়ে ফেলল।

আমি তোমায় চিনলাম। কত দেশ-বিদেশেই তো ঘুরে বেড়ালাম, কিন্তু এমন ভরাট শান্ত স্নিগ্ধ মাতৃরূপ তো আর আমার চোখে পড়েনি। সে রাজরাজেশ্বরী বিশ্বমাতার অন্নপূর্ণা-রূপে দু-চোখ আমার ডুবে গেল! তোমার বিহ্বল চোখের চাওয়াতেও জন্ম-জন্মান্তরের মাতৃত্বের অতৃপ্ত ক্ষুধিত চেনা চাওয়া দেখেই আমি চিনলাম, এ যে আমারই হারা-মায়ের দৃষ্টি! তুমি বলেছিলে নাকি, তোমার কোন-সে অতীত-জন্মের হারা-মানিককে খুঁজে পেতেই এমন করে বারেবারে শত শত মা-হারা ছেলের মা হচ্ছে। এমন করে বিশ্বমায়ের ফাঁদ পেতেছ, সেই পলাতকা শিশুকে ধরবার জন্য। তাই তুমি ধর্ম-সমাজ কিছু মানোনি, সকল পথে-পাওয়া ছেলেকেই সমানভাবে কোল দিয়েছ। আকাশে বাতাসে আমার মনের কথা ধ্বনিত হলো, ওরে, এবার আমায় পথে বেরিয়ে পড়া সার্থক হয়েছে! এবার আমি বুঝি 'অসংখ্য বন্ধন মাঝে লভিব মুক্তির স্বাদ'। কত কথাই না মনে হলো তখন, সে যেন কেমন এক অভিভূতের ভাব। সেসব মনে পড়ে এত বিহ্বল হয়ে পড়ছি আমি যে, আজ তা জানাতে গিয়ে ভাষা হারিয়ে ফেলছি। ... যাক, সে

রাত্রিতে বড় শান্তির ঘুম ঘুমালাম—এই সুখে যে, আজ আমি ঘরের কোলে ঘুমাচ্ছি। ... তারপর, বুকে তীর বিঁধে আবার যখন আহত পাখিটির মতন রক্তবমন করতে করতে তোমার দ্বারে এসে লুটিয়ে পড়লাম, তখন তুমি আর মাসি-মা আমায় কী যত্নেই না বুকে করে এসে তুলে নিলে। তোমরা আর আমার ঐ শিশু-বোন কটিই আবার যমের দ্বার হতে আমায় ফিরিয়ে আনলে। আজ ভাবছি কী ঘরের মায়ায় বনের হরিণকে মুগ্ধ করলে? আশীর্বাদ করো মা, তোমাদের এই দেওয়া প্রাণ যেন তোমাদেরই কাজে লাগিয়ে যেতে পারি।

বনের পাপিয়া

টেপাখোলা স্টিমার-স্টেশন।

পূর্ণচাঁদের প্রেম-জ্যোৎস্নার ছোঁওয়ায় পদ্মা নদী যেন আবিষ্টা হয়ে দুলছে। তার হৃদয়ের আনন্দ দেহের কূলে কূলে আছড়ে পড়ছে।

কূলে বসে ফরিদপুরের ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট মি. দুঃশাসন মিত্রের স্ত্রী রমলা।

মি. মিত্র অস্থির চিত্তে পায়চারি করছেন আর মাঝে মাঝে এসে তাগাদা দিচ্ছেন—'রমলা, রাত প্রায় নয়টা হলো—এইবার ওঠো।' রমলা আবিষ্টার মতো পদ্মার ঢেউ দেখছিল—কোনো উত্তর দিল না। দূরে আবছায়ার মতো একটা ডিঙি নৌকায় সরল ভাটিয়ালি সুরে কার বাঁশি বেজে উঠল। রমলা উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলে উঠল—'ওগো দেখেছ? ঐ চাঁদ যেন কৃষ্ণ, পদ্মা যেন রাধা—ওর ঢেউ যেন নীল শাড়ি, কৃষ্ণকে দেখে ওর সারা দেহে প্রাণে যেন নাচন লেগেছে। ঐ দেখো, বাঁশি শুনে ওর উন্মাদ দশা আরো বেড়ে উঠেছে!'

মি. মিত্র রমলাকে অত্যন্ত ভয় করতেন। ও বড় জেদি মেয়ে। অপরূপা সুন্দরী, তার ওপর বাপের বাড়ি থেকে বিপুল অর্থ ও সম্পত্তি নিয়ে এসেছে। অত্যন্ত আনন্দ-চঞ্চলা, তবু কোথায় যেন তার কী অভাব। হঠাৎ সে হয়ে যায় অন্যমনস্কা। তার মুখে কোনো না-জানা বিরহের ছলছল ছায়া পড়ে। রমলাকে এই অবস্থায় দেখলে মি. মিত্র অত্যন্ত ব্যস্ত হয়ে পড়েন। ওর এই ভাবের কোনো অর্থ না পেয়ে সাংসারিক অর্থের কথা পেড়ে আরো অনর্থের সৃষ্টি করেন। রমলা কেঁদে-কেটে মোটরে করে পদ্মার তীরে গিয়ে চুপ করে বসে থাকে। মি. মিত্র—দুঃশাসন নাম হলেও তাকে শাসন করতে পারেন না। কারণ ঐ মোটর তারই বাবার টাকায় কেনা—ওঁর চাকরি রমলারই বাবার সুপারিশে।

রমলা যখন পদ্মা নদীর ঢেউ আর চাঁদকে রাধা-কৃষ্ণের লীলা মনে করে আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে যা মনে আসছিল বলে যাচ্ছিল—তখন মি. মিত্র একটু রুক্ষ কণ্ঠেই বলে উঠলেন—'কীর্তন শিখতে গিয়ে তোমায় এই পাগলামিতে ধরেছে রমলা।' রমলার বাবা কৃষ্ণভক্ত, বাড়িতে রোজ সন্ধ্যায় কীর্তন হয়। রমলাও কিছু কিছু কীর্তন গাইতে পারে। ও যখন গায় তখন ওর মন যেন বৃন্দাবনে চলে যায়—যত না গায়, তার চেয়ে কাঁদে বেশি।

রমলা কোনো উত্তর দেওয়ার আগেই কোথা হতে একটা পাখি উড়ে এসে একেবারে রমলার বুকের উপর এসে পড়ল। রমলা চমকে 'উঃ' বলে চীৎকার করে উঠতেই মি. মিত্র পাখিটাকে ধরে বলে উঠলেন—'রমলা, রমলা, দেখেছ কী সুন্দর একটা পাখি! এ কি, এর যে ডানা ভাঙা!' রমলা মি. মিত্রের হাত থেকে পাখিটাকে কেড়ে নিয়ে বুকে চেপে ধরে

দেখতে লাগল। কি পাখি, কিছুতেই চিনতে পারল না। মি. মিত্র বললেন, 'হরবোলা।' রমলা অনেকক্ষণ ধরে পাখিটাকে নেড়েচেড়ে দেখলেন। আশ্চর্য পাখিটা যেন ওর কতকালের পোষমানা, উড়ে যাবার কোনো চেষ্টা করল না। মি. মিত্র কেবলই বলতে লাগলেন, 'দেখছ না, ওর নিশ্চয়ই ডানা ভাঙা, নইলে উড়বার চেষ্টা করছে না কেন?'

রমলা ধরা গলায় বলে উঠল—'বাড়ি চলো!' পাখিটা দিব্যি মাথা গুঁজে পড়ে রইল, ও যেন ওর হারানো নীড় ফিরে পেয়েছে—চোখ দুটি যেন ঘুমে আবিষ্ট, একটুও নড়ল না।

বাড়ি এসে মি. মিত্র হৈ চৈ বাধিয়ে দিলেন পাখিটাকে রাখা যায় কোথায় এ নিয়ে। রমলা তার ড্রইংরুমে পাখিটাকে নিয়ে ঢুকে চমকে উঠল। তার বুকের আঁচলে রক্তের দাগ কোথা থেকে এল? পাখিটাকে নাড়াচাড়া করে দেখল, ওর কণ্ঠ দিয়ে রক্ত ঝরছে—কোনো বন্য পশু বা সাপ হয়তো ওকে আক্রমণ করেছিল। রমলার বুকে যেন ঐ আহত পাখির বেদনা বেজে উঠল। সে তাড়াতাড়ি হলুদ আয়োডিন চুন প্রভৃতি লাগিয়ে পাখিটাকে বুকে জড়িয়ে কাঁদতে লাগল—ও যদি না বাঁচে! বাপের বাড়িতে রমলাকে ওর দাদারা 'ছিঁচকাদুনি' বলে ডাকত, পশুপক্ষীর এতটুকু দুঃখ দেখলে সে কেঁদে ভাসিয়ে দিত। সে কেবলই বাড়ির ঝি চাকরদের বলতে লাগল, 'দেখেছিস, পাখিটা যেন আমার কতকালের পোষা, এই দেখো ছেড়ে দিচ্ছি, তবু পালিয়ে যায় না।' বলেই পাখিটাকে বুকে চেপে অজস্র চুম্বন করতে লাগল। একটু পরেই মি. মিত্র হাঁপাতে হাঁপাতে শহর থেকে একটা মস্ত খাঁচা নিয়ে এসে বললেন, 'রমলা, এই দেখো, খাঁচা নিয়ে এসেছি—দেখেছ খাঁচাটা কি সুন্দর! বলেই রমলার হাত থেকে পাখিটাকে নিয়ে খাঁচায় পুরে বলতে লাগলেন—'এ জাতের পাখি তো কখনো দেখিনি! খানিকটা বৌ কথা কও পাখির মতো দেখাচ্ছে—পাপিয়াও হতে পারে।' দু-একজন চাকর সায় দিয়ে বলল, 'আজ্ঞা হাঁ, এটা পাপিয়া।'

আহত পাখির কণ্ঠে এখন প্রায় 'পিউ কাঁহা, পিউ কাঁহা' স্বর শোনা যায়।

রমলার চার পাঁচ বছর বিয়ে হয়েছে, সন্তানাদি হয়নি। তার বিশেষ শখ আছে বলেও মনে হয় না। সবাই বলে ও যেন কেমন এক ধরনের মেয়ে। বন্ধুবান্ধবও বিশেষ কেউ নেই। অন্য সব অফিসারদের স্ত্রীরা আলাপ করতে আসেন, সে আলাপ ভদ্রতা সৌজন্যের আলাপেই শেষ হয়। বন্ধুত্ব কারুর সাথেই হলো না। এতে মি. মিত্র মনে মনে খুশি—আলাপ জমলে যদি খরচা বাড়ে। মি. মিত্র বেশ খানিকটা কৃপণ। চাকরেরা বলে, পিঁপড়া নিঙড়ে উনি গুড় বের করেন।

মাস খানেক পরে দেখা গেল, পাপিয়াটা খাঁচায় থাকতে চায় না—কেবলই পাখা ঝাপটে বাইরে বেরিয়ে আসতে চায়। রমলার প্রথম প্রথম ভয় হত, ও যদি উড়ে যায়। ভয়ে ঘরের দোর বন্ধ করে খাঁচার বাইরে এনে বুকে চেপে ধরে ছেড়ে দিয়ে দেখত, ও পালিয়ে যেতে চায় কিনা। খাঁচার আশ্রয়ের চেয়ে রমলার বুকের আশ্রয় যেন পাখিটার অনেক বেশি মধুর লাগত। সে রমলার বুকে এসে কেবলই ডাকত—'পিউ কাঁহা, পিউ কাঁহা।' রমলা হেসে বলত—'আমি কি জানি!' বলেই চুমো খেত, চোখ দিয়ে তার অকারণে জল আসত। কয়েক মাস পর দেখা গেল পাখিটা অদ্ভুত পোষ মেনে গেছে।

ওর উড়ে যাবার কোনো ইচ্ছা বা চেষ্টা নেই। বাসার সকলেই দেখে আশ্চর্য হয়ে গেল যে পাখিটা প্রায় অনেক কথাই শুনে শুনে আধো আধো ভাবে বলতে পারে। ঝি চাকরদের নাম ধরে ডাকে। কীর্তন শুনলে—'রাধাকৃষ্ণ রাধাকৃষ্ণ' বলে অনবরত উচ্চ হতে উচ্চস্বরে কণ্ঠ চড়িয়ে যেন কাঁদতে থাকে। রমলা গান থামিয়ে ওকে বুকে জড়িয়ে অশ্রু ছলছল কণ্ঠে বলে—'বৃন্দাবনের পাখি।' মি. মিত্রের বন্ধুবান্ধব চাকর ঝি সবাই বলে—'ও হরি-বোলা।' কারণ, হর-বোলা পাখি দেখতে এ রকম হয় না। কত বাড়ি থেকে কত লোক পাখিটাকে দেখতে আসে। এক বছর হয়ে গেছে—এখন পাখিটা অনেক কথা বলতে পারে। ...

হঠাৎ পাখিটাকে কি রোগে ধরল, রমলাকে দেখলেই 'পিয়া, পিয়া' বলে ডেকে ওঠে। রমলার হৃদয় আনন্দে দুলে ওঠে—সেই আনন্দের মাঝে সে কী যেন গভীর বেদনার আভাস পায়। কোথা হতে এল এই বনের পাখি, কে শিখালো তাকে এ ডাকনামে ডাকতে? ও কি বৃন্দাবনের দূত? ও কি কৃষ্ণের বেণুকা? পাখিকে বুকে জড়িয়ে সে কাঁদতে থাকে—ওকে না দেখে সে থাকতে পারে না। যেখানে যায়, সাথে করে পাখিটাকে নিয়ে যায়। ...

প্রথম প্রথম মি. মিত্রও পাখিটাকে অত্যন্ত ভালবাসতেন। তিনি রমলার কাছে গেলেই পাখিটা ডেকে উঠত—'চোখ গেল, চোখ গেল!' রমলা হেসে বলত—'ছেড়ে দেও, ওর হিংসে হচ্ছে, ও সব বুঝতে পারে!' মি. মিত্র পাখিটাকে দেখিয়ে দেখিয়ে রমলাকে আরো বেশি আদর করতেন—পাখিটা তত ডাকত—'চোখ গেল, চোখ গেল!' দুজনে হেসে গড়িয়ে পড়ত।

আগে পাখির হিংসা হতো এখন মি. মিত্রের হিংসা হয়। রমলা যেন মি. মিত্রের চেয়ে পাখিটাকে বেশি ভালোবাসে। সর্বদা পাখির চিন্তা, ওকে নিয়ে খেলা। ও কিসে ভালো থাকবে, কি খাবে—ইত্যাদি নিয়ে অহেতুক ভয় ভাবনা। পাখি পিঁজরায় থাকবে, দুবার ডাকবে—ভালো লাগবে, বুকে নিয়ে নাহয় খানিক আদরও করল, কিন্তু রাতদিন পাখি আর পাখি—আঁখি ছাড়া হতে দেবে না, এ যেন তাঁর কাছে দুঃসহ হয়ে উঠল।

একদিন বলেই ফেললেন—'রুমু, তুমি বড় বাড়াবাড়ি করছ পাখিটাকে নিয়ে।' রমলার বুকে কে যেন চাবুক মারল—সে আহত ফণিনীর মতো ফণা তুলে বলে উঠল—'তার মানে?' মি. মিত্র উষ্ণ কণ্ঠে চীৎকার করে উঠলেন, 'তার মানে আমার চেয়ে তুমিই বেশি বোঝো!'

রমলা আরক্ত মুখে নত নেত্রে কী খানিকক্ষণ ভাবল, তারপর ধীর কণ্ঠে বলল, 'আমাকে কখনো কারুর সাথে মিশতে দেখেছ, ছেলে কি মেয়ে?' মি. মিত্র বললেন, 'না! রমলা আবার বলল, 'আমার আচরণে চলাফেরায় কখনো এমন ভাব দেখেছো যা তোমাকে পীড়া দেয়?' মি. মিত্র হঠাৎ যেন অপরাধীর মতো রমলার হাত ধরে ব্যাকুল কণ্ঠে বলে উঠলেন, 'ও কথা কেন বলছ রুমু? সত্যি, অন্য বন্ধুদের স্ত্রীদের আচরণ, চলাফেরা, অন্যের সাথে মেলামেশা দেখে আমার গা রি রি করতে থাকে। আধুনিক ছেলেমেয়েদের মেলামেশায় যে কুৎসিত অসংযমের পরিচয় পাই, তার আভাস পর্যন্ত

পাইনি কোনদিন তোমার জীবনে। আমি এইখানে নিজেকে পরম ভাগ্যবান মনে করি। রমলার চোখ দুটি শুকতারার মতো ঝলমল করতে লাগল—মাঝে মাঝে সে এমনি করে মি.মিত্রের দিকে চায়। মি.মিত্র এই দৃষ্টিকে অত্যন্ত ভয় করেন—এ যেন কোনো দেবীর দৃষ্টি—শ্রদ্ধায় ভয়ে মি.মিত্রের তখন রমলাকে প্রণাম করতে ইচ্ছা করে।

রমলা বলল—'ঐ পাখির কণ্ঠে বৃন্দাবন কিশোরের আহ্বান শুনি। ও তো পাখি নয়, ও যে তাঁর হাতের বেণুকা—ওকে বুকে ধরে আমি শ্রীকৃষ্ণের শ্রীকরের স্পর্শ পাই। ওকে যদি হিংসা করো তাহলে ভাবব, তুমি অসুর, তোমার সাথে আমার কোনো সংস্পর্শ থাকবে না।'

মি.মিত্র সহসা যেন অসুর হয়ে উঠলেন। অজগর সাপের মতো তাঁর চোখ জ্বলতে লাগল। চীৎকার করে বলতে লাগলেন—'জানি, তোমার বাবার অনেক টাকা, —আমার সম্পত্তি, চাকরি সব তাঁরই দেওয়া, তুমি অনায়াসে আমায় ছেড়ে যেতে পারো, চাই কি আর একটা বিয়েও করতে পারো'—রমলা মি.মিত্রের কথা শেষ হতে দিল না, প্রদীপ্ত মহিমায় সে যেন অসি-লতার মতো ঝলমল করে উঠল, সারা অঙ্গে যেন অপরূপ জ্যোতি ফুটে উঠল। মি.মিত্রের সামনে দাঁড়িয়ে সে বলল—'তুমি অসুন্দর, তুমি কুৎসিত, তোমাকে দেখলে, তোমার কথা শুনলে আমার পরম সুন্দরকে ভুলে যাই—এই সুন্দর পৃথিবী আমার কাছে বিস্বাদ হয়ে ওঠে! তুমি আমার কাছ থেকে সরে যাও!' শেষের কথা কয়টি যেন আদেশের মতো শুনাল।

রমলা সোফারকে ডেকে মোটরে করে মি.দত্তের বাড়ি চলে গেল। মি.দত্ত একজন বৃদ্ধ মুন্সেফ, তাঁর স্ত্রী রমলাকে মেয়ের মতো আদর করেন। রমলার বন্ধু-বান্ধব বলতে এই এক মিসেস দত্ত। রমলা এঁকে মা বলে সম্বোধন করে—তার মা নেই।

সন্ধ্যায় বাড়ি ফিরেই তার মনে হলো—এই কলহের আবর্তে পড়ে সে পাখিটার কথা একেবারেই ভুলে গেছিল। সারাদিন তাকে ডাকেনি, তার কথা স্মরণ করেনি, তাকে দেখেনি। তার বুক অসহ্য ব্যথায় টনটন করতে লাগল। সে প্রায় উন্মাদিনীর মতো তার ড্রইং রুমে ঢুকতেই দেখল—পিঞ্জর শূন্য, পাখি নেই! রমলার সমস্ত শরীর যেন টলতে লাগল। সে মূর্চ্ছিতা হয়ে পড়ে গেল।

বহুক্ষণ পরে মূর্চ্ছা ভঙ্গ হলে সে চাকরদের ডেকে বলল—'আমার পাপিয়া, পাপিয়া কোথায় গেল?' ঝি চাকর কেউ কোনো উত্তর দিল না। রমলার বুঝতে বাকি রইল না, যে, মি.মিত্রই পাখিটাকে হয় ছেড়ে দিয়েছেন, কিংবা—

এমন সময় মি.মিত্র ঘরে ঢুকলেন।

রমলার সারা দেহ যেন দিব্যশক্তির জ্যোতিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। সে মি.মিত্রের সম্মুখে দাঁড়িয়ে স্থির কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করল—'আমার পাপিয়া কোথায়?' মি. মিত্র কর্কশ কণ্ঠে বলে উঠলেন—'বনের পাখিকে বনে ছেড়ে দিয়ে এসেছি।'

রমলা তার বেণী খুলতে খুলতে বলল—'তাহলে আমিও বনে চললুম।'

মি.মিত্র দৈত্যের মতো তাঁর প্রকাণ্ড শরীর দুলিয়ে বললেন, 'বনে গিয়েও তাকে আর পাবে না—তার পাখা ভেঙে সে যেখান থেকে এসেছিল, সেই পদ্মার তীরে বনে ফেলে

দিয়ে এসেছি—সে এতক্ষণ বন-বেড়াল বা সাপের গর্তে গিয়ে মুক্তিলাভ করেছে নাহয় পদ্মার ঢেউ তাকে ভাসিয়ে নিয়ে গিয়েছে।' মি. মিত্র যতক্ষণ উগ্র মূর্তি ধারণ করে এই কথা বলছিলেন, রমলা ততক্ষণে তার সমস্ত অলঙ্কার কাঁকন চুড়ি খুলে কেশ এলিয়ে অপরূপ নিরাভরণা মূর্তিতে আবিষ্টার মতো দুলতে দুলতে বলল—'তুমি তাকে আহত করতে পারো, কিন্তু হত করতে পারো না। সে যে বৃন্দাবনের পাখি। তুমি আমার পতি—স্বামী, কিন্তু ও পাখি যাঁর দূত হয়ে এসেছিল তিনি আমার পরম পতি, পরম স্বামী। জনমে জনমে আমি তাঁর দাসী, তাঁর প্রিয়া। তুমি জানো, তুমি যতদিন আমার স্বামী ছিলে, ততদিন আমি আমার কোনো কর্তব্যে অবহেলা করিনি। আমার সমস্ত দেহমনপ্রাণ দিয়ে তোমার সেবা করেছি। আমার সমস্ত ঐশ্বর্য তোমাকে দিয়েছি। ঐ ঐশ্বর্য দিয়ে তুমি আবার বিয়ে করো। জানি না কার অভিশাপে অসুরের পত্নী হয়ে এসেছিলুম। আমি কি পূর্বজন্মে তুলসী ছিলাম? কৃষ্ণবক্ষ বিলাসিনী তুলসীকে শঙ্খ-চূড় দৈত্যের পত্নী হতে হলো। কিন্তু অভিশাপের দীর্ঘদিন যখন কাটল তখন শ্রীকৃষ্ণ তাঁর তুলসীকে কেড়ে নিয়ে গেলেন। আমারও অভিশাপের জীবন আজ শেষ হলো, আর এই পৃথিবীতে আমি আসব না, আর কোনো অসুন্দর আমাকে স্পর্শ করতে পারবে না। পাপিয়া!—পাপিয়া! ঐ যে সে আমায় পিয়া পিয়া বলে ডাকে? আমি তোমার ডাক শুনেছি—আমি যাব—তোমার কাছে যাব।' —বলেই উন্মাদিনীর মতো পদ্মাতীরের দিকে ছুটল।

মি. মিত্র ক্রোধোন্মত্ত ছিলেন বলে তাকে ধরতে গেলেন না। গুম হয়ে বসে রাগে কাঁপতে লাগলেন।

রমলা পথে যায় আর ডাকে, 'পাপিয়া, আমার পাপিয়া!'

তখন রাত্রি দ্বিপ্রহর। ঊর্দ্ধগগনে শুক্লা একাদশীর চাঁদ তার সামনে জ্যোৎস্নায় যেন বিরহিনী শ্রীরাধার দিব্য অশ্রু ঝরে পড়ছে। জনহীন পথ, নদীর পাশে বন, সেই বনে উন্মাদিনী রমলা শতবার আছাড় খায়। কাঁটালতায় তার নীলাম্বরী হয়ে যায় ছিন্ন ভিন্ন, অঙ্গ হয়ে যায় ক্ষতবিক্ষত—তবু সে ভাবে—'পাপিয়া—আমার বৃন্দাবনের পাপিয়া ফিরে আয়, ফিরে আয়।'

সহসা যেন পদ্মানদীর বালুচরে সেই চেনা কণ্ঠের ডাক শোনা গেল—'পিয়া—পিয়া!' রমলা পদ্মার চরে আছাড় খেয়ে পড়তেই আহত বক্ষে শ্রান্ত কণ্ঠে মুমূর্ষু পাপিয়া তার বক্ষে এসে ডাকতে লাগল—'পিয়া—পিয়া!' রমলা মৃত্যু-আহত পাখিকে বক্ষে নিয়ে পদ্মার স্রোতে ঝাঁপিয়ে পড়ল! তার এলোকেশ পদ্মার ঢেউয়ে তরঙ্গায়িত হয়ে উঠল। তার অঙ্গের জ্যোতিতে পদ্মা যেন উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। পদ্মার জলে তার মুখখানি যেন নিবেদিত পদ্মের মতো ভাসতে লাগল। চন্দ্রালোকিত ঊর্দ্ধ আকাশের পানে তার মুখ উন্মুখ হয়ে যেন কাকে দেখতে চাইল! বুকের পাপিয়াকে দুই হাতে করে ঊর্দ্ধে তুলে বুকে জড়িয়ে ধরল। পদ্মার ঢেউয়ে পদ্মা তার কৃষ্ণ ভ্রমরকে বুকে নিয়ে কোথায় ভেসে গেল কে জানে!